ফিমিনোলোজি
বিজয়ের রং-ধ্বনি
২০২৫

# জুলেখা বানুর বিজয় দিবস

2nd

জয়ন্ত ডালু

- কই রে খোকা? আজকে আর কাউকে ডাকা লাগবে না। বেলা পড়ে এলো বাড়ি চল।
- আর কয়ে কজন হলে ই তো খাবারগুলো শেষ হয়ে যাবে।
- আজকের মতো যথেষ্ট বেচাকেনা হয়েছে। রাতে আর রান্না করবো না। এগুলোই গরম করে খাব।
- আচ্ছা, মা। তাহলে সব গুছি য়ে ফে লি ?

জুলেখা বানু ছেলেকে সরঞ্জামগুলো গুছাতে সাহায্য করতে উদ্যত হলে ছেলে রায়হান তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না! না! তোমার করতে হবে না। আমি একাই পারবো। কদিন হলো তোমার জ্বর, মাথা ব্যথা। তবু যে এই অসুস্থ শরীর নিয়েই রান্নাবান্না করছো, বসে বসে বিক্রি করছো এটাই বেশি।

জুলেখা বানুর ঠোঁটের কোণে কোমল হাসি খেলে গেল। সে হাসি মুখে বলল, কী যে বলিস খোকা! কাজ না করলে টাকাপয়সা কোত্থে কে আসবে ? তাছাড়া রান্না করে না আনলে তো এই রিকশা, ভ্যানওয়ালারা এসে খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে। দুপুরে খাবারের জন্য ওরা আমার ভরসায়ই বসে থাকে। নারে বাপ, ওতে কিছু হবে না। রায়হান আরো জোর দি য়ে বলল, না, তুমি বিশ্রাম করো। কয়েকটা জিনিসপত্রই তো। আমি বেশ পারবো। সরঞ্জাম অল্পই – খাবারের হাঁড়ি পাতিল, বেশ কয়েকটা ধোঁয়া-আধধোঁয়া প্লাস্টিকের প্লে ট, গ্লাস, দুটো পানির বোতল, একটা পাটি। কিছুক্ষণের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে একটা ভ্যান ডেকে তারা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রাতে জুলেখা বানুর জ্বর আরো বেড়ে গেল। কোনোরকমে রাতের খাবার খেয়ে সে শয্যাশায়ী হলো। মায়ের কথা মতো রায়হান তাকে ঔষধ এনে খাইয়ে দিল, মাথায় পানি দিয়ে দিল। তারপর পাশের বাসার তরিকুলের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসা পুরনো বাংলা বইটা উলটে পালটে দেখতে লাগলো। বেশকিছুদিন আগে রায়হানের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার পঞ্চম শ্রেণিতে উঠবে সে। হঠাৎ করে জুলেখা বানুর ডাকে সে তড়ি ঘড়ি করে তার কাছে এগিয়েগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মাথায় কী আরও পানি দিতে হবে , মা?

- না, আর দিতে হবে না। অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়। আগামীকাল আবার সকাল সকাল উঠে স্কুলে যেতে হবে।

গামছা থেকে পানি নিংড়ে জুলেনখা বানুর মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে রায়হান বললো, সে আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু তুমি তো অসুস্থ তোমাকে রে খে স্কুলে যাওয়া ঠিক হবে ?

- তোর যা পাকা পাকা কথা! এই যে ঔষধ খেলাম, তুই মাথায় পানি দিয়ে দিলি , এখন আবার জলপট্টি দিয়ে দিচ্ছিস – এরপরে ও কী জ্বর থাকবে , বোকা ছেলে ? আজ রাতের মধ্যেই সেরে যাবে দেখিস।
- কালকের মধ্যে জ্বর না কমলে আমি কিন্তু আনন্দ দাদার কাছে যাবো। তখন আর আমাকে আটকাতে পারবে না। প্রমিস করো...

- প্রমিস কী আবার?
রায়হান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেনো তুমি জানো না?
- নাতো, খোকা।
রায়হান সগর্বে বলল, এইটা একটা ইংরেজি শব্দ। এটার মানে শপথ করা।
জুলেখা বানু জ্বরে মলিন হয়ে যাওয়া মুখে এক চিলতে হাসি মেখে বললেন, ইংরেজি! মূর্খ মানুষ আমি। আমি কি তোর মতো পড়ালেখা করেছি, খোকা? তুই তো আমার থেকে অনেক বেশি জানিস। স্কুলে পড়িস কতকিছুই। আমাকে ওসব শেখাস সময় করে।
রায়হান কাচুমাচু হয়ে লজ্জারাঙা মুখে বলল, অল্প অল্প পারি।
- আরও ভালো পারবি। বড় ক্লাসে উঠতেছিস না এইবার? আরও অনেক কিছু শেখাবে স্কুলে। সেদিন তো কে যেন বিমান চালাতো মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গল্প পড়ে শুনিয়েছিলি।
রায়হান মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান – পাইলট।
কিছুক্ষণ উসখুস করে সে বলল, মা একটা কথা বলি ? কাউকে বলবেনা কি ন্তু।
জুলেখা বানু বলল, কি কথা খোকা? বল।
- আমি ও বড় হয়ে মতিউর রহমানের মতো পাইলট হতে চাই। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে চাই।
জুলেখা বানু ছেল র কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল; তার চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল। নিজের মাতৃস্নেহের সমস্তটা নিজে র ঠোঁটে সঞ্চিত করে ছেলের কপালে চুমু দিয়ে বলল, আমার সোনা ছেলে। পাইলট হবি ? তোর যা ইচ্ছা তুই তাই করিস। ওপরওয়ালা তোর মনের সব ইচ্ছা পূরণ করুন–এই দোয়া করি।
মায়ের কথায় রায়হান খুব খুশি হলো। তবে মায়ের জ্বরতপ্ত দেহের আলিঙ্গনে থেকে তার জ্বরের তীব্রতা পুনরায় অনুধাবন করে বললো, তাহলে প্রমিস করছো তো যে কালকে জ্বর না কমলে আনন্দ দাদাকে জানাবো। আমাকে যেতে দেবে।
- তোর দাদাকে আর বিরক্ত করার দরকার নেই। অনেক করেছে আমাদের জন্য। কিছু একটা হলেই আনন্দ দাদাকে গিয়ে খবর দেয়া! বেচারা নি জেই ছাত্র মানুষ। দুদিন আগে ই জ্বর হয়েছে শুনে ঔষধ-ফলমূল কিনে দিয়ে গেল।
- দাদা তো বলে ছে জ্বর না কমলে খবর দিতে।
- সে নেহাতই ভালো মানুষ তাই বলেছে। আজকে রাতের মধ্যেই সেরে উঠবো দেখিস। নে এখন ঘুমিয়ে পড়, খোকা।
রায়হান বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ঘুমন্ত ছেলের মায়াভরা মুখের দিকে জুলেখা বানু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, বড্ড ধকল যাচ্ছে ছেলে টার ওপর দিয়ে। মায়ের জন্য কতই না চিন্তা এতটুকু ছেলের! হবে ই না বা কেন? সে যে আমারই নাড়ি ছেড়া ধন। একান্ত আপনার বলতে তো মা-ই আছে ওর।

বাপতো লাপাত্তা আজ বছর চারেক হয়ে যাচ্ছে । (উল্লেখ্য জুলেখা বানুর স্বামী, রিকশাচালক রহমত আলী, যখন বছর চারেক আগে নিখোঁজ হলো তখন রায়হানের বয়স চার পেরিয়ে পাঁচ-এ পড়ে ছি ল। স্বামীর সন্ধান না পেয়ে জুলেখা বানু দিশে হারা হয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পেরেছিল যে রহমত আলী নারায়ণগঞ্জে দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সে আর রহমত আলীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি । সৎমায়ের সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক টানাপোড়েনের কথা চিন্তা করে গ্রামের বাড়িতেও যায়নি । হাতে কিছু জমানো টাকা ছিল সেটাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা ভাবতে ভাবতে পাইকারি দরে ফুল কিনে ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করার পরিকল্পনা করে সে। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। কয়েক মাস ফুল বিক্রি করে তা থেকে কিছু টাকা জমা হওয়ার পর প্রতিবেশীর কাছ থেকে আরও কিছু টাকা ধারনিয়ে ফুল বিক্রির পাশাপাশি দুপুরে খাবার রান্না করে ফুটপাতে বসে তা বিক্রি করার পরিকল্পনা করে সে । সেই থেকে শুরু। দুপুরে সে নিজ হাতে রান্না করা খাবার বিক্রি করে আর সকালে বা সন্ধ্যায় টিএসসি , রমনা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় ফুল বি ক্রি করে )।

তারপর ছে লে র পাইলট হওয়ার স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তার। দেশপ্রেমে উদ্বেলিত হয়ে নিজের প্রাণ সপে দেওয়া এক বীরশ্রেষ্ঠের মতো নিজেকে গড়ে তোলার স্বপ্নের কথা শুনে গর্বে বুক ভরে উঠেছিল তার। কিন্তু নিজের আশপাশের ভাঙাচোরা তৈজসপত্র, দড়ি তে টানানো জরাজীর্ণ পোশাকপরিচ্ছদ, আধভাঙা হাতপাখা, নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকা বাল্বের দিকে তাকিয়ে মনটা দমে গেল। তারপর কি একটা ভেবে সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙে বসে চৌকির নিচ থেকে মরচে ধরা মাঝারি আকারের একটা লোহার ট্রাঙ্ক টেনে বের করল। তারপর শাড়ির আঁচলে বেধে রাখা চাবির গোছা থেকে লাল রঙ দিয়ে দাগ দেওয়া ছোট্ট একটা চাবি দিয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলে তার ছোট্ট জীবনে সঞ্চিত সকল মূল্যবান জিনিসপত্রের পসরা খুলে বসল। জিনিসপত্রের পরিমাণ খুব বেশি নয়। বিয়ের লাল টকটকে শাড়ি আর কাবিননামাটা এখনো যত্ন করে রেখে দিয়েছে সে। আর আছে একটা রূপার চেইন, একগোছা কাঁচের চুড়ি, দুইটা নতুন শাড়ি, একটা কাঁথা, কয়েকটা কাঁচের প্লেট, গ্লাস, একসেট কাটা চামচ, কিছু পুরনো ছবি। এছাড়াও একটা অংশ জুড়ে রায়হানের জন্য গত বৈশাখী মেলার সময় কেনা শার্ট আর প্যান্ট, দুইটা টেপাপুতুল, একটা প্লাস্টিকের বন্দুকও রয়েছে। সে তার ছাইরঙা নতুন শাড়ির ভাজ থেকে জমানো কিছু টাকা বের করে গুনতে শুরু করল। গুনে শেষ করে সেই টাকাগুলোর সাথে আরো তিনটা একশো টাকার নোট নতুন করে শাড়ি র ভাজে রেখে দিল। তারপর মনে মনে ভাবল, কয়েকদিন পরপর এভাবে কিছু টাকা জমাতে পারলে রায়হানের পড়ালেখায় কোনো সমস্যা হবে না। আর কোনো সমস্যা হলে জগন্নাথ হলের আনন্দ ছেলেটা তো আছেই। আর তার বন্ধুরাও কত ভালো মনের মানুষ! ওরা রায়হানের পড়ালেখা বন্ধ হতে দেবেনা। এসব ভেবে তার মনে আবার আশার সঞ্চার হয়। ছেলের স্বপ্ন যেন পূর্ণ হয় এই প্রার্থনা করতে থাকে। তারপর ট্রাঙ্কের একপাশে রাখা একটা পতাকা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। এই পতাকাটার জন্য গতকাল দুপুর থেকে কেদে -কেটে একাকার হয়েছে রায়হান। তাই সন্ধ্যায় আবার গিয়ে দরদাম করে নিয়ে এসেছে জুলেখা বানু। রায়হান টের পায়নি। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ওর হাতে দেবে বলে ভেবে রেখেছে সে। মনে মনে সে বলল, বড্ড খুশি হবে, খোকা।

পরের দিন সকালে জুলেখা বানু রায়হানের হাতে পতাকাটা তুলে দলে তার আনন্দ দেখে কে। স্কুল ড্রেস পড়ে পরিপাটি হয়ে পতাকা হাতে সে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সাথে জুলেখা বানু। জ্বর কিছুটা কমায় সেও যাচ্ছে ছেলের সাথে । এই দিন তো বছরে একবারই আসে। আজ ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ। ঢাকায় যেন এইবার তুলনামূলক আগেই শীত পড়েছে বলে জুলেখা বানুর মনে হলো। কুয়াশার চাদর ভেদ করে মা-ছেলে হেটে চলেছে মহান বিজয় দিবসের আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে। পূর্ব আকাশে রক্তিম সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়ছে। মৃদুমন্দ উত্তুরে বাতাস বইছে। সেই শীতল বাতাসে শরীরের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠছে । জুলেখা বানু দূর থেকে মাইকে ভেসে আসা দেশাত্মবোধক গানের আওয়াজ শুনতে পেল – "জয় বাংলা বাংলার জয় ", "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি ", "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে"। এ যেন অন্য এক ঢাকা শহর। চারিদিকে কেমন একটা উৎসবের আমেজ। বাসাবাড়ি, দোকানপাট লাল-সবুজ পতাকা দিয়ে সাজানো। রাস্তা দিয়ে যতগুলো গাড়ি, রিকশা, মোটরসাইকেল তাদের অতিক্রম করে গেল সেগুলোর প্রায় সবগুলোতেই জাতীয় পতাকা দোদুল্যমান।

স্কুলে পৌঁছে রায়হান তার বয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে পতাকার দিকে মুখ করে জাতীয় সংগীত গাইতে শুরু করলো,

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥"

জুলেখা বানু কিছুটা দূরে দাড়িয়ে ছিল। দীর্ঘদিন পর এত কাছ থেকে সমস্বরে জাতীয় সংগীত শুনে তার শরীরে আলোড়ন খেলে গেল। নিজের শৈশবের স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে আঁচড় কাটতে লাগলো। মন থেকে অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে নির্গত হলো এক গোপন অভিসার, হে আল্লাহ পাক, আমার খোকা যেন দেশপ্রেম ও বিজয়ের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে , অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, আর লালসবুজের ঝান্ডাধারী হয়ে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে স্বপ্নের ডানা মেলে উড়তে পারে । এই দুখিঃনী মায়ের দোয়া কবুল করো পরওয়ারদিগার।